কথকতা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কথকতা বহু প্রাচীন শিল্প যাকে আমরা ইংরেজিতে 'আর্ট' বলি। কথকতা শব্দটাতেই ইঙ্গিত পাচ্ছি যে এ কেবল কথার শিল্প। একটা বিষয়বস্তুকে কেবলমাত্র কথার মাধ্যমে একটি আখ্যানে রূপান্তরিত করাই হচ্ছে কথকতার সার্থকতা। এই যে মৌখিক বাক্যের গ্রন্থনা একে সাধারণ ভাষায় ঘটকালি বলা হয়। যিনি ঘটনার বর্ণনা করেন, তিনিই ঘটক, অথবা যিনি দুই পক্ষের মধ্যে সংযোজন ঘটান তাঁকেও ঘটক বলা হয়। যে কোনো কাহিনীর দুটি দিক থাকে,—একটি যা ঘটছে তার দিক, অপরটি তার প্রতিঘাতের দিক। এই ঘাত-প্রতিঘাতকে নিয়েই ঘটকের কারবার। রাধা অভিসারে যেতে উদ্যত হয়েছেন, কিন্তু গৃহজনের বাধা তাঁর কাছে প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে। কীর্তনীয়া যখন এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবৃতি করেন কথার অবসরে তখনই তাকে ঘটকালি বলে, কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁর কথায় সব সমস্যার অবসান হয়, রাধার অভিসার সার্থক হয়। এই জন্যেই যিনি যত বড় কীর্তনীয়া, তিনি ঘটকালিতেও ততটাই পারদর্শী। কিন্তু এ গেল কীর্তনের কথা। কথকতা ঠিক এই বস্তু নয়। কথকতা আগাগোড়াই কথার শিল্প ; তবে কথতাতেও গান থাকে। যিনি উত্তম কথক এবং সুগায়ক, তিনি উভয়ের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ঘটান, যিনি ততটা পটু নন তাঁকে বাক্যাংশের ওপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয়।

কথকতা ভারতের সর্বাংশে সব ভাষাতেই আছে এবং আজও সেই আর্ট বিলুপ্ত হয়েছে, এমন কথা বলা যাবে না ; যদিচ শহরে কথকতার আসর নানা কারণে আজকাল খুব কমই দেখা যায়। কথকতা লিখিত সাহিত্য নয় ; অতএব এর যথেষ্ট প্রাচীনত্ব থাকলেও তাকে নিয়ে কোনো সাহিত্য রক্ষিত হয়নি ; সমস্ত শিল্পটিই মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। তবে অভিনয়াংশে এর প্রচার আছে, যেমন 'পুতুল নাচ'। আসলে পুতুল নাচ প্রত্যক্ষ দর্শনের বস্তু হলেও তার সমস্ত পালাটি ফুটে উঠছে কথকতার মাধ্যমে। পটচিত্র নিয়েও এইরকম কথকতা আছে। এইভাবে কথকতা কখনো কখনো কোনো একটা মাধ্যমকে আশ্রয় করেও গড়ে উঠেছে।

কথকতার সঙ্গে কিন্তু কবিগানের তুলনা চলে না, কারণ কবিগান কথকতার মতন উৎকৃষ্ট আর্টে পরিণত হতে পারেনি, চটুল সাময়িক রুচিকে কেন্দ্র করেই তার প্রচলন গড়ে উঠেছিল এবং পতন হতেও বেশি বিলম্ব হয়নি। পাঁচালি আর কথকতার মধ্যে একটা ধারাগত মিল আছে, কিন্তু পাঁচালিতে কবিগানের কাব্যধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে এবং মধ্যে মধ্যে গানের অবসর রাখা হয়েছে। পাঁচালি গোটাটাই কবিতার আঙ্গিকে নিবদ্ধ এবং এতেও বহু সাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করা হয়েছে। তথাপি পাঁচালি

আসলে পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে নিয়েই রচিত হত, তবে তার মধ্যে কবিতার কৃত্রিমতা, অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি প্রচুর থাকত। কিন্তু, যে কারণে কবিগান বিলুপ্ত হয়েছে, পাঁচালির বিলোপও সেই কারণেই ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হয়না, কারণ সমাজ এবং জনরুচি পালটে গেছে, আর এইসব মাধ্যম জনগণের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়না।

কথকতার অনুরূপ আর একটি ধারা প্রচলিত আছে, সেটি হচ্ছে পাঠের রীতি। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে পাঠ করা হয়। এই পাঠের একটি সুচারু পদ্ধতি আছে, কখনো কখনো তাতে সুরের রেশ লেগে থাকতেও দেখা যায়। পাঠ করবার অবসরেও যে গানের অবতারণা ঘটেনা তা নয়, তথাপি পাঠের প্রণালী আর কথকতা এক জিনিস নয়; কথকতার কোনো প্রত্যক্ষ অবলম্বন নেই। সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকেই একটি আখ্যানবস্তুকে নির্বাচন করা হয় এবং কথক সেটিকে নাটকের মতন ধীরে ধীরে দৃশ্যের পর দৃশ্য ধরে উন্মোচন করতে থাকেন। এর মধ্যে কোনো চটুল বাক্যবন্ধ প্রবেশ করলে তা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য। এই কারণেই কথকতার গাম্ভীর্য একটি স্বতন্ত্র বস্তু এবং সম্পূর্ণ কল্পনার মধ্যে এর সঞ্চরণ যে চিত্র ফুটিয়ে তোলে তা প্রতি শ্রোতার মানসপটে এক একটি চলচ্চিত্রের অবতারণা করে বললে অত্যুক্তি হয় না। পাঁচালিকারেরও অবশ্য এই স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ পদবন্ধগুলিকে সেই অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে হয়। এটি সহজ ব্যাপার নয়, এর জন্য অনেক পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করতে হয়, নতুবা অন্যভাবে প্রয়োগ করতে হয়। কথকতায় এই বাধা কথককে পীড়িত করেনা, তিনি মনের কথা অনায়াসে প্রকাশ করতে পারেন; তাঁর মুখনিঃসৃত গদ্য নানাভাবে অত্যন্ত সুললিত ভঙ্গিতে শ্রোতার মনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

কথকতা, কবিগান এবং পাঁচালি,—এই তিনটিই গত শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে কথকতা প্রাচীনতম এবং কথকতার কথনশৈলীকেই কবিগান এবং পাঁচালির মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল। পদাবলী কীর্তনে এবং পালাকীর্তনেও এর প্রবেশ ঘটেছিল, কিন্তু তা কীর্তনের শিল্পের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। কথকতার বৈশিষ্ট্য এই যে পুরাণকাহিনী ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়বস্তুকে এর অন্তর্গত করা হয়নি। প্রধানত যে কথকতা শোনা যায়, তা রামায়ণের আখ্যানভাগকে গ্রহণ করেই পরিণতি লাভ করেছে। এই শ্রেণীর কথকদের অনেক সময় 'রামকথক' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী নিয়েও যে কথকতা রচিত হয়নি এমন নয়, তবে তার দৃষ্টান্ত খুবই কম। এর সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন শ্রীধর কথক। নিধুবাবু যেমন সর্বাংশে টপ্পার সৃজনশীলতা নিয়ে বাংলায় সঙ্গীতে ভাস্বর হয়ে আছেন তেমনি শ্রীধরও তাঁর কথকতাকে অবলম্বন করেই কথকতার শিল্পজগতে তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। টপ্পা থেকে বাংলার সঙ্গীতের বহু গায়ক-গায়িকার বিবরণ আমরা জানি; এঁদের সঙ্গীতের সঙ্কলন নিয়ে বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনেক

স্বরলিপির বই-ও পাওয়া যায়, কিন্তু কথকদের জীবনকাহিনী তেমন ভাবে অথবা আদৌ সঙ্কলিত হয়নি। এর প্রধান কারণ কথ্যবস্তুকে নিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং বোধ করি তার উপায়ও ছিল না। শ্রীধর কথকের বিবরণও আমরা পেতুম না, যদি না তিনি উত্তম সঙ্গীত রচনা করে যেতেন। আসলে এই সঙ্গীতগুলিই রক্ষিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গেই তাঁর জীবন কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। আমার মনে হয়, বর্তমানে যাঁরা এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা বা আলোচনা করছেন, তাঁদের কর্তব্য হবে কথকদের জীবনীসহ একটি তালিকা সংগ্রহ করা। প্রতি জেলায় যদি এই সংগ্রহের উদ্যম করা যায়, তাহলে আজও হয়তো বহু কথকের কার্যধারা এবং কথনশিল্প সম্বন্ধে আমরা অনেক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব। এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, সেটাও অস্বীকার করা যায় না। আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক, কিন্তু মানুষ হয়েছি পূর্ববঙ্গে। উক্ত অঞ্চলে আমি কথকতার আয়োজন বা প্রচার দেখিনি। এর একটি প্রধান কারণ, কথকতায় কথার শিল্প গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের ভাষার আশ্রয়ে, পূর্ববঙ্গের কথিতভাষায় এইরকম শিল্প গঠিত হবার কোনো সুযোগ ছিল না। অবশ্য শুদ্ধ বাংলাভাষায় কথকতাকে যে দাঁড় করানো যেতে পারেনা তা নয়, কিন্তু তাতে যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হবে তা শ্রোতার কাছে উপাদেয় হবে বলে আমার মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলবার আছে। আজকাল স্ত্রীকণ্ঠে কথকতার একটা প্রচার হতে দেখা যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনেক যন্ত্রের সহযোগিতাও থাকে। দেখেছি স্ত্রী-শিল্পীরা আগে থেকেই একটি খাতা থেকে লিখিত আখ্যানভাগ পাঠ করেন এবং তৈরি গান গেয়ে থাকেন। কথকতার আদর্শ এটা নয়, উপযুক্ত কথক কখনো লিখিত গল্পাংশ পাঠ করেন না, তাঁদের সমস্ত অনুষ্ঠানটিই 'একস্‌টেম্‌পোর' (উপস্থিত-মতন বাগ্মিতা) এবং এইটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক উপাদান। আমার এও মনে হয়েছে যে স্ত্রীকণ্ঠ কথকতার সর্বতোভাবে উপযোগী নয়, কারণ কথকতায় এমন একটা গাম্ভীর্য থাকে যা কেবলমাত্র পুরুষকণ্ঠেই উচ্চারিত হলে ভাল শোনায়। পদাবলী কীর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্য স্ত্রীকণ্ঠের প্রচলন বহুদিন ধরে আছে ; কিন্তু তাও অনেক পরিমাণে সীমিতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, কারণ সব আখর স্ত্রীকণ্ঠের উপযোগী হয় না। পাঁচালির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে স্ত্রীলোকেরা দল গঠন করলেও নিজেরা গানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন না।

যাই হোক, প্রসঙ্গত, শ্রীধর কথকের জীবনকাহিনী কিছুটা বিবৃত করা যাক, কারণ ইনি শুধু কথকতার ক্ষেত্রেই নয় গানের ক্ষেত্রেও একজন স্বনামধন্য পুরুষ। আরও একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে কলকাতা থেকে বেশ দূরে বাস করেও, তিনি এই শহরে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এটা সেকালে আর কারুর ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে জানিনে।

শ্রীধর কথক ১৮১৬ সালে হুগলী জেলায় বাঁশবেড়ে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিধুবাবু তখনো বেঁচে, তবে তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর। শ্রীধর দেখতে খুব ভালো

ছিলেন ; তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর কথকতায় এবং গানে খুব সহায়তা করেছিল। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং ভাগবতে তাঁর উত্তম অধ্যয়ন ছিল। তাঁর জ্যাঠা জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি তাঁকে মুরশিদাবাদে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করেন, কিন্তু শ্রীধর ব্যবসায়ে মন লাগাতে পারলেন না। বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্যের কাছে তিনি কথকতা শিক্ষা করেন, কিন্তু নিজস্ব রীতিতে একটি কথনশৈলী গঠন করেছিলেন। তাঁর পিতা রতনকৃষ্ণ শিরোমণিও কথক ছিলেন, কিন্তু বোধ করি পিতার সাহচর্যলাভের সুযোগ তিনি পাননি। তাঁর পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণও প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। তাঁরা বংশানুক্রমে সকলেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কেউই গান রচনায় খ্যাতিলাভ করেননি। শ্রীধর উত্তম গায়ক ছিলেন, তবে নিধুবাবুর প্রভাব তাঁর ওপর যথেষ্ট পড়েছিল। অনেক সময় তাঁর গানের সঙ্গে নিধুবাবুর গানের পার্থক্য নিরূপণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। শ্রীধর তাঁর কথকতার ধারা এবং সঙ্গীত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্যকে শিক্ষা দিয়ে যান এবং তাঁর কাছেই শ্রীধরের সমস্ত রচনা রক্ষিত ছিল। শ্রীধর কলকাতায় এসে গান করেছেন এরকম প্রসিদ্ধি নেই ; কিন্তু তাঁর গানগুলি গায়কদের মুখে মুখে কলকাতায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তবে, তাঁর কথকতার রীতি বোধ করি কলকাতায় প্রচলিত হবার সুযোগ পায়নি।

এই বিবৃতি থেকে জানা যাবে বহরমপুর এবং মুরশিদাবাদ অঞ্চল পদাবলী কীর্তনের মতন কথকতাতেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। হুগলী জেলাতেও কথকতার প্রচলন মন্দ ছিল না, কিন্তু অন্যান্য জেলাতে কথকতার প্রচার সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। কথকতার মূলে উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা ; সংস্কৃত নাটকেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাই। কিন্তু নাটকের মধ্যে অনেক কৃত্রিমতা প্রবেশ করেছিল, নাট্যবস্তুর বাইরের কোনো ধারাই নাটকে প্রবেশ করতে পারত না। তাই, নাটক ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের মাধ্যমে একটা উচ্চস্তরের আর্টে পরিণত হয়েছিল যা অপর কোনো রীতিতে প্রবেশ করতে পারেনি। তখনকার দিনে লোকশিক্ষা বলতে বোঝাতো রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এইসব শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারেই সমাজে চরিত্রগঠন ও জীবনধারার গতি নির্ধারিত হত। এই কারণেই কথকতা পুরাণ-কথার বাইরে অন্য বিষয়ে বিস্তৃত হতে পারেনি এবং সেরূপ ইচ্ছাও কথকগণ পোষণ করতেন না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে লোকশিক্ষা ব্যতীত ভক্তিবাদ কথকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা এবং করলে তার পরিমাণ কতখানি। কথকতা অবশ্যই ভক্তিবাদে প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু তা কীর্তন বা ভাগবতপাঠের মতন ভক্তির ঐকান্তিকতায় মুখর হয়ে ওঠেনি। নাটকে ভক্তিবাদ অবান্তর কারণ নাটক তার নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে নিয়েই অনুষ্ঠিত হত ; সেখানে প্রতিটি সংলাপ নির্দিষ্ট করাই থাকত এবং নাটক এই সংলাপকে অবলম্বন করেই লিপিবদ্ধ ঘটনাটুকুকে ফুটিয়ে তুলত। এ সবই যেন অপরের গড়া বাগানের পরিকল্পনা অনুযায়ী গাছ-গাছড়ার পরিচর্যা, তার বেশি কিছু

যোগ করে অতিরিক্ত সুষমা সম্পাদনের সুযোগ সেখানে নেই। কথকতা ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে না, কারণ বিষয়বস্তু কী হবে সেটা কথকঠাকুর নিজেই ঠিক করেন, তার সম্পূর্ণ সংগঠনের দায়িত্ব তাঁরই। বর্ণনা, সংলাপ, বস্তু পরিকল্পনা এবং বিবৃতি,—সবই কথকের আন্তরিক নির্দেশে পরিচালিত হয়ে একটা পরিণতিতে পৌঁছোয়। শ্রোতা সেখানে তাঁর মনশ্চক্ষে একটা কাহিনীর মনোজ্ঞ অবতারণা দেখবার সুযোগ পান। তাঁর সামনে কোনো পুরাণ নেই যার পাঠোদ্ধারের দায়িত্ব পাঠকের ; অথবা কোনো লিখিত নাটক নেই যা নটনটীদ্বারা অভিনীত হচ্ছে। কথকতা হচ্ছে সম্পূর্ণ মনোধর্মী অনুষ্ঠান যা কথকের মন থেকে শ্রোতার মনে পৌঁছে তাকে নানাভাবে আবিষ্ট করে রাখছে। এ হচ্ছে কথকঠাকুরের নিজের গড়া বাগান, যেখানে তৃণ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পত্র-পুষ্পের সমারোহ তিনি নিজেই সৃষ্টি করে নানাভাবে তার প্রতিকৃতিকে মহিমান্বিত করে তুলছেন, কিন্তু অন্তিম বলতে এর কিছু নেই,—একে প্রতিষ্ঠিত করে রাখা যাবে না,—কেননা এ কথন কাহিনীর জন্যে নয়, কল্পনাকে কল্পলোকে শোভিত করবার জন্যে। কথার সঙ্গে সঙ্গেই কথকতার পরিসমাপ্তি, বাগ্মিতার এ এক অদ্বৈত প্রয়োগ, যার আর কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। □